মুল্লাহ উমার এবং তালেবানের যেভাবে উত্থান হলো

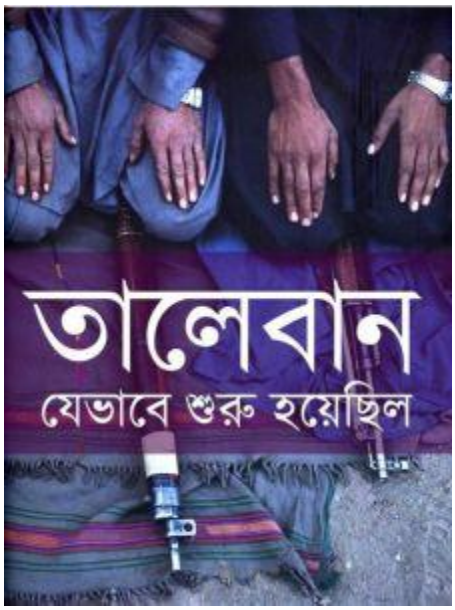

১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মকাল। মধ্য এশিয়ার একটি দেশে দুজন আরোহী মোটর সাইকেলে করে ছুটে চলেছেন। বাহনটিতে দুজন আরোহী। কিছুদিন আগেই তারা কয়েকজন মিলে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন।
একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ, একটি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।

তিনি কাজটি করার জন্য যাদের সহায়তা পেয়েছিলেন তারা সবাই মাদ্রাসার ছাত্র। সুশীল সমাজের বিশিষ্ট জনদের কর্মব্যস্ততা এতই বেশি যে তাদের ফুসরত নেই মানুষের বিপদাপদে এগিয়ে যাবার। আরো কিছু লোক এগিয়ে এসেছিলেন সেই মোটর সাইকেল আরোহীদ্বের আহবানে সাড়া দিয়ে, তাদের কেউ স্থানীয় ব্যবসায়ী কিংবা স্বচ্ছল কৃষক। তাদের ছোট্ট দলটি গঠিত হয়েছিল মাদ্রাসার শরীয়াহ বিভাগে অধ্যয়নরত ছাত্র, মৌলভী এদের নিয়ে।

গ্রামের লোকদের জন্য সময়টি ছিল উৎসবের। বিয়ের অনুষ্ঠান , বরযাত্রী চলছে দলবেঁধে। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির হাইওয়েতে কোন নিরাপত্তা নেই, ডাকাত আর চোরের দলের উৎপাত এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, রাস্তার পাশে মরা লাশ পড়ে থাকলেও তা লোকজনের কাছে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এতটাই স্বাভাবিক যে, কেউ গাড়ি থামিয়ে লাশটিকে কবর দেয়া দূরে থাক, পথচারীরা পর্যন্ত দুবার ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করে না।

এহেন পরিস্থিতিতে, যে বিপদের আশংকা ছিল, ঘটলো তাই। বরযাত্রীদের দল হাইওয়ে ডাকাতদলের খপ্পরে পড়ল, হতাহতের ঘটনা ঘটল, মহিলাদের উঠিয়ে নেয়া হল অপহরণ আর ধর্ষণের জন্য। স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের

গণ্ডারের চামড়ায় সাধারণত ময়না তদন্তের আগে অনুভূতি হয় না। মাদ্রাসার একজন মোল্লা এই ঘটনায় ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হলেন, তিনি বের হলেন "আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহিয়ানিল মুনকার" এর ডাকে, সাথে ছিলেন আরো মাদ্রাসার ছাত্ররা, যাদের বলা হয় তালেব। তালেবের বহুবচন 'তালেবান' মানে অনেকগুলো ছাত্র।

কিছু মহিলাদের উদ্ধার করা সম্ভব হলো, আবার অনেকে ইতোমধ্যে নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। গ্রামের লোকজনের আবেদনে যে প্রশাসন নির্বিকার ছিল সেই প্রশাসনকে বসিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। কাবুলের শাসক রব্বানীর অনুগত গভর্ণর ও তার প্রশাসনকে কান্দাহার প্রদেশের গ্রামের লোকেরা বের করে দিল। শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার সাথে তারা স্বেচ্ছায় তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব তুলে দিল যে লোকটির হাতে তাঁর নাম মোল্লা মুহাম্মদ ওমর, মুজাহিদ। যিনি সবার আগে এগিয়ে গিয়েছিলেন চোর আর ডাকাতদলের হাত থেকে মুসলিম নারীদের ইজ্জত রক্ষা করার ডাকে সাড়া দিয়ে।

কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, একা এভাবে এগিয়ে যাবার শক্তি তিনি কোথায় পেলেন?
কিভাবে তিনি বাকি লোকদেরকেও সাহসী অগ্রযাত্রার সাথী করে নিলেন?

আসুন শুনি তাঁর নিজের জবানীতে,

"তখন আমি মাদ্রাসায় পড়ালেখা করি, মাদ্রাসাটি ছিল "সানজ সার" শহরে, কান্দাহারে। আমার সাথে আরও প্রায় ২০ জনের মত সহপাঠী ছিল। এরপর দেশে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ল, খুন হত্যা, লুটতরাজ, ডাকাতি এগুলো সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, আর দেশের নিয়ন্ত্রণ ছিল দুর্নীতবাজ, বাজে সমাজপতিদের হাতে। 'এই সমাজের অবস্থার উন্নতি ঘটবে, আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে' ; সবচেয়ে আশাবাদী লোকেরাও এমন আশা করা ছেড়ে দিয়েছিল। এমনকি আমি নিজেও তাদের মতই ভাবছিলাম, এরপর নিজেকেই বললাম, "আল্লাহ তায়ালা কখনো কাউকেই তার শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না" (বাকারাহ ২৮৬)

এরপর আমাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট মনে হল, নইলে আমি হয়তো এই বিষয়গুলো ছেড়ে দিতাম, কারণ কোন কিছুই আমার সামর্থ্যের মধ্যে ছিল না। কিন্তু আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, খাঁটি ভরসা, আর যেকেউ আল্লাহর উপর এ ধরণের তাওয়াক্কুল করে, তার আশা কখনো হতাশায় পরিণত হয় না।

মানুষ হয়তো ভাবতে পারেঃ কখন এই আন্দোলন শুরু হল? কারা এর পিছনে ছিল? অর্থায়ন কারা করল? পরিচালনা করল কারা আর নিয়ন্ত্রণ করল কারা?

আমি তাদের বলব, এই আন্দোলন তো শুরু হয়েছে সেদিন, যেদিন আমি আমার মাদ্রাসাতে বইটি ভাঁজ করে রেখে দিলাম, আমি আমার সাথে আরেকজন ভাইকে নিয়েছিলাম, এরপর আমরা দুজনে মিলে পায়ে হেঁটে যানযাওয়াত এলাকার দিকে গেলাম। এরপর সেখান থেকে আমি একটি মোটরসাইকেল ভাড়া নিলাম, যে আমাকে ভাড়া দিয়েছিলেন তার নাম ছিল 'শুরুর', এরপর আমরা তালুকান এলাকায় গেলাম। আর, এভাবেই আমাদের আন্দোলন শুরু হল, আপনাদের মনে যদি অন্য কোন চিন্তা উঁকি দিয়ে থাকে তাহলে সেগুলো ঝেড়ে ফেলুন !

এরপর আমরা এক মাদ্রাসা থেকে আরেক মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে দেখা সাক্ষাত শুরু করলাম, ছাত্রদের যে সকল হালাকা (স্টাডি সার্কেল) ছিল সেগুলোতে যেতাম, একদিনের ঘটনা, সেদিন সকাল বেলায় আমরা একটি স্টাডি সার্কেলে যাওয়ার পর দেখলাম সেখানে ১৪ জনের মতন ছাত্র অবস্থান করছে, এরপর আমি তাদেরকে একত্রিত করলাম আমার চারপাশে, আর বললাম, "আল্লাহর দীন এখন মানুষের পায়ের নিচে , মানুষ প্রকাশ্যে বেহায়াপনা, অশ্লীলতা করছে, খারাপ কাজ করছে, আর অপরদিকে যারা দীন মেনে চলার চেষ্টা করছে তারা তাদের দীনকে গোপন করে আছে, আর অসৎ লোকেরা পুরো এলাকায় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে আছে, তারা মানুষের সম্পদ চুরি করে, রাস্তায় তারা মানুষের ইজ্জত হানি করে, খুন করে, এমনকি যদি কারো মরা লাশ রাস্তার উপর পড়েও থাকে, তাহলে মানুষ নির্বিকার চিত্তে তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যায় , গাড়ি চালিয়ে চলে যায় আর দেখে রাস্তার উপর একটা মরা পড়ে আছে, এমনকি কোন লোক যে এসে লাশটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে দাফন করবে তাও খুঁজে পাওয়া যায় না"।

আমি তাদেরকে আরও বললাম, "এই রকম জরুরী অবস্থার মধ্যে শুধুমাত্র পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকা সম্ভব না, চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব না, আর এই সমস্যাগুলো স্লোগান দিয়ে সমাধান করা সম্ভব না, যার পিছনে কোন সমর্থন নেই। আমরা, তালেবে ইলম (ইলমের ছাত্ররা), এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতে চাই। যদি তোমরাও সত্যি সত্যি চাও আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করতে, তাহলে আমাদের পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ততা থেকে অবসর নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর আমি তোমাদেরকে খুলে বলছি, একটা মানুষও আমাদেরকে একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করার ওয়াদা করেনি, তাই তোমাদের এরকম মনে করার কোন কারণ নেই, আমরা আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করব আর বিনিময়ে অন্য কেউ আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিবে। বরং, মানুষের কাছ থেকেই অনুরোধ করে আমাদের নিজেদের খাদ্য ও সাহায্য চেয়ে নিতে হবে"।

আমি বলেছিলাম, "এটা একদিনের কাজ নয়, এক সপ্তাহ , এক মাস কিংবা এক বছরের কাজও নয়, বরং এতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। তোমরা কি সেটা করতে তৈরি আছ নাকি না ?"

"গ্রীষ্মের সেই দিনগুলো ছিল খুব গরমের , মনে হতো যেন কালো রঙয়ের কেটলীতে কেউ পানি গরম করছে , আর আমি তাদেরকে উৎসাহিত করতে লাগলাম আর বলেছিলাম, 'আজ এই রকম পরিস্থিতিতে তোমরা নিজ নিজ কেন্দ্রে বসে থাকতেই বেশি পছন্দ করছো ! অথচ তারা সরাসরি আল্লাহর দীনের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে , আর আমরা কিনা দাবী করছি আমরা আল্লাহর দীনের লোক! শরীয়াহর ছাত্র, অথচ আমরা শরীয়াহর সমর্থনে কোন কাজ করছি না" !

তাদেরকে আমি বললাম, "আমরা যদি কোন একটি এলাকা জয় করতে পারি, তাহলে সেটি রক্ষা করব, আর সেই অবস্থায় কেউ এ ধরণের কথা বলো না, হায় এখন কোন পড়ার ব্যবস্থা নেই, টাকা পয়সার অভাব, অস্ত্র নেই...; কাজেই তোমরা বলো তোমরা কি এই কাজগুলো করতে তৈরি আছো ?"

এরপর সেই চৌদ্দ জনের মাঝে একজনও খুঁজে পাওয়া গেল না , যে এই সকল কাজ করতে তৈরি আছে, তারা বলল, 'জুমার দিনে হয়তো আমরা এই কাজগুলোর কিছু কিছু কাজ করতে পারি', উত্তর শুনে আমি বললাম, "তাহলে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে কে এই কাজগুলো করবে?"

আমি আল্লাহকে আমার সাক্ষী মেনে বলছি, এটাই ছিল বাস্তবতা, আর আমি যাবতীয় ইজ্জতের মালিক আল্লাহর সামনে শেষ বিচারের দিনে এই ঘটনার সাক্ষ্য দিব।

আমাদের এই আন্দোলন ছিল আল্লাহর উপর খাঁটি তাওয়াক্কুলের একটি ফলাফল, কেননা সেদিন যদি আমি ঐ কয়েকজন ছাত্রের উপর ধারণা করে বাকি মাদ্রাসা, স্টাডি সার্কেলের প্রতিও একই রকম ধারণা করে বসে থাকতাম, তাহলে হয়তো আমি নিজেও আমার পড়ালেখায় মন দিতাম, মাদ্রাসায় ফেরত যেতাম। কিন্তু আমি আমার নিজের উপর আল্লাহর জন্যে যে শপথ করেছিলাম তা পূর্ণ করার দিকে মন দিলাম , আমি যে শপথ নিয়েছিলাম তা পূর্ণ করেছি, আর আল্লাহও আমাকে সেইভাবেই চালিত করেছেন যেমনটা আজকে আপনারা দেখছেন। এরপর আমি আরেকটি পাঠশালাতে গেলাম, সেখানে প্রায় সতের জন ছাত্র ছিল, তো আমি তাদেরকে বিষয়টা উপস্থাপন করলাম যেভাবে প্রথম হালাকাতে আমি উপস্থাপন করেছিলাম (যারা ছিল তালেবে ইলম বা ইলমের ছাত্র তথা মাদ্রাসার ছাত্র), এবারে এই হালাকার সতের জনের সবাইকেই পাওয়া গেল যারা আমাদের প্রস্তাবে আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করতে রাজী ছিল।

তারা প্রত্যেকেই ছিল যেন একটি জাতি সমতূল্য , তাদের মাঝে যুবক-বৃদ্ধ কোন পার্থক্য ছিল না, শিশু কিংবা যুবক, আর না নারী না পুরুষের উপর ভিত্তি করে কোন পার্থক্য ছিল, বরং এই (আল্লাহর দীনের) কাজটি ছিল আল্লাহ আমাদের যে ইলম জ্ঞান দান করেছেন তার উপর। তাই এ কাজের শুরু থেকেই আমাকে একের পর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

এরপর আমরা যে একটি মোটর সাইকেল ভাড়া করেছিলাম, সেটিতে চড়ে একের পর এক মাদ্রাসা, স্কুল ও স্টাডি সার্কেলে ভ্রমণ করতে লাগলাম আসরের সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত । আর সে সময় দেখা গেল তিপ্পান্ন জন লোক আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে কাজের জন্য তৈরি আছে। এরপর আমি আমার মাদ্রাসায় ফেরত আসলাম আর তাদেরকে বললাম, "আগামীকাল সকালে এসো", কিন্তু তারা রাতের বেলায় সবাই একসাথে সানয সার'এ এসে হাজির হল, আর এটাই ছিল শুরু।

আমাদের আইডিয়ার বয়স চব্বিশ ঘণ্টা পার হবার আগেই আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেল। আর আমার একজন বন্ধু তাদের সালাতে ইমামতি করল, ফযরের সালাতে ইমামতি করার পর সেখানে উপস্থিত একজন বলল, "আজকে রাতে আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম , আমি দেখলাম ফেরেশতারা সানয সার'এ প্রবেশ করছে, আর কি কোমল ছিল তাদের হাতের পরশ, তাই আমি তাদেরকে অনুরোধ করলাম যেন তারা আমার মুখমণ্ডলে বরকতের জন্য মাসেহ করে দেয়"।

পরদিন সকাল দশটার দিকে, আমরা 'আল-হাজ বিশর' থেকে দুটা গাড়ি চেয়ে নিলাম, তিনি একজন এলাকার ব্যবসায়ী, তিনি আমাদেরকে দুটি গাড়ি দিলেন, একটা ছোট কার, আরেকটা বড় কার্গো ট্রাক। এরপর আমরা সব ছাত্রদের "কাশক নুখুদ" এলাকার দিকে সরিয়ে নিলাম, এরপর বাদবাকি অন্যান্যরাও আমাদের সাথে যোগ দিল। আর যখন একসাথে অনেক লোক জমায়েত হল, আমরা লোকদের কাছ থেকে অস্ত্র ধার করলাম, আর এভাবেই শুরু হয়েছিল আমাদের প্রতিরোধ আন্দোলন, যেভাবে আজকে পর্যন্ত তা চলে আসছে..." তাঁর বক্তব্যের শেষ- আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন, বিজয় দান করুন এবং মুজাহিদিনদের সাহায্য করুন। আমিন।

হ্যাঁ, এটাই ছিল আন্দোলনের সূত্রপাত যতক্ষণ না আমেরিকা ইসলামিক আমিরাতের উপর হামলে পড়ল। যখন আমেরিকা এই ইসলামিক রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করল , তারা ইতিহাসকে যেন পালটে দিল, যেন তারা সাম্প্রতিক অতীতের এই বাস্তবতাকেও পালটে দিতে চাইল। 'তালাবাহ' দের নাম দেয়া হল বিদেশী এজেন্ট,

পাকিস্তানী ইন্টিলেজেন্সের দেশীয় রক্তপিপাসু দোসর, একদল লুটেরা, হাইওয়ে ডাকাত, খুনী যারা কিনা যমীনে নিজেদের কর্তৃত্ব ও অনাচার প্রতিষ্ঠা করতে চায় !!!

আর কত সহস্র বই, বিশ্লেষণ, অভিযোগ, ধোঁকা, চক্রান্ত ইত্যাদি করা হল এই ইসলামিক ইমারাহ'র বিরুদ্ধে যা চায় শুধুমাত্র ইসলাম। এই বইগুলো লাইব্রেরী স্থান নিয়েছে, বইয়ের অক্ষরগুলো যেমন কালো যারা এগুলো লিখেছে তাদের অন্তরগুলোও তেমনি কালো। মিথ্যা, অতিরঞ্জন, প্রতারণা, এবং বিশুদ্ধ নির্বুদ্ধিতা যার কোন ভিত্তি নেই, এদের কোন স্থিতিশীল অবস্থান নেই, যেমন বাতাসে একটা গাছের ডাল দোল খায় কিংবা একটা পালক ভেসে বেড়ায় এরাও তেমনি ভাসমান, পরজীবি।

আর এখন যারা কাছে কিংবা দূরে যেখানেই আছে, তারা জানেন, তালাবাহরা কোনদিনই পাকিস্তানী ইন্টিলিজেন্স এর খেলনা ছিল না। এখন আমেরিকা এবং পাকিস্তান সরকার উভয়েই তাদের দিকে এক তীরে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করছে। আর এখন তালাবাহ সারা দুনিয়ার কাছে প্রমাণ করে দিয়েছে-যে, তারাও রাজনীতি বুঝে, তারা আমেরিকানদের ট্রিকস এর ফাঁদে পড়ে না, আরব কিংবা নন আরব মুনাফিকদের ফাঁদে পড়ে না, বাকি সারা দুনিয়ার মানুষের ফাঁদেও না।

আমরা পুনরায় ফেরত যাচ্ছি সেই আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহের দিকে,

"কান্দাহারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল, দলে দলে তালেবে ইলম'দের বহর আসতে লাগল, কান্দাহারের সীমানাবর্তী দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশগুলো থেকে জনসাধারণ আসতে লাগল, তারাও এই তালেবে ইলমদের কাছে অনুরোধ জানাল যেন তাদের প্রদেশের কর্তৃত্ব নেয়া হয় এবং সেখানেও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারা সেই প্রদেশগুলোতে কর্তৃত্ব ও শরীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সহায়তা করতে লাগলেন। আর এভাবেই, 'তালিবান'- 'তালেব' শব্দটির পশতু বহুবচন, যার অর্থ ইসলামী শরীয়াহ'র ছাত্রবৃন্দ- আফগানিস্তানের এক পঞ্চমাংশ অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল, কোন ধরণের লড়াই ছাড়াই, বরং এখানে মানুষের নিরাপত্তা কামনা ও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছাই ছিল প্রধান শক্তি।

আলেম, মৌলভী, মোল্লাহদের সামাজিক মর্যাদার কারণে; শরীয়াহ ইলমের ছাত্রদের প্রতি মানুষের সম্মানবোধের কারণে কোন রকম বড় বাধা ছাড়াই তালাবাহরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। উত্তরের প্রদেশ, পূর্বে সবদিকে, আর কাবুলের শাসক রব্বানী এর কাছে এই খবর পৌঁছেছিল যে, তার প্রতিদ্বন্দী হিকমাতায়ার এর লোকেরা নিজেদের কাবুল থেকে পৃথক করে নিয়েছে, তাই তিনি তালাবাহদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোন অফিসিয়াল অবস্থান ঘোষণা করেননি বরং তিনি শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সাহায্য করেন যেখানে মানুষের কাজের জবাবদিহিতা আছে। কিন্তু হিকমাতায়ার তার ফোর্সদের আদেশ করেন যেন তারা তালাবাহদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে। তাই গযনী এলাকাতে কিছু সংঘর্ষ হল, এরপর উত্তর দিকে এভাবে কাবুলের দিকে একের পর এক এলাকা প্রায় উল্লেখযোগ্য কোন লড়াই ছাড়াই পতন হতে লাগল। এমনকি, বিভিন্ন দল গোষ্ঠী, যেমন চোর হাইওয়ে ডাকাত দল এরা পর্যন্ত শরীয়াহ ইলমের তালাবাহ বা ছাত্রদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দ্বন্দে ভুগতে লাগল।

অন্যান্য দল যেমন, 'ইউনুস খালিস' এরপর 'হাক্কানী' ফোর্স বাতকিয়াতে,খোস্তে তাদের ভূমি সমর্পণ করল, সায়াফে অধিকাংশ ফোর্স লড়াই থেকে বিরত থাকলো, নানকারহার এর রাজধানী জালালাবাদ এর লোকজন যখন তালাবাহদের সামনাসামনি দেখল, তাদের শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কথা জানলো, আমর বিল মারুফ ওয়া

নাহিয়ানিল মুনকার এর কথা জানতে পারল, তাদের নিরাপত্তা, হাইওয়ে চোর ডাকাত নিধনের কথা ইত্যাদি জানতে পারল তারাও তালাবাহদের সমর্থনে এগিয়ে এল।

এরপর তালাবাহরা কাবুলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল, সেখানে একটি সাধারণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। ১৫০০ আলেমের উপস্থিতিতে ৩১ মার্চ হতে ৩রা এপ্রিলের সেই বৈঠকে মোল্লাহ মুহাম্মদ ওমর কে আনুষ্ঠানিকভাবে তালাবাহদের আমির নিযুক্ত করা হল এবং উপাধি প্রদান করা হল 'আমির আল-মুমিনিন', আর সেদিন থেকেই তালাবাহদের কাছে শরয়ী আমির হিসেবে তিনি গৃহীত হয়ে আসছেন আর তাদের মতে তাকে একজন খলীফার যাবতীয় দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

তালাবাহরা কাবুলের সীমান্তে পৌঁছে গেলেন আর রব্বানীর কাছে কিছু অনুরোধ নিয়ে গেলেন যার মধ্যে প্রধান চারটি হচ্ছে-

১-শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে
২- সরকার হতে কমুনিষ্ট ও তাদের অনুসারীদের অপসারণ করতে হবে
৩- স্টেট ভবন হতে নারীদের অপসারণ করতে হবে
৪-দুর্নীতি, পতিতালয়, সিনেমা, গান-বাজনা, অশ্লীল ভিডিও ইত্যাদি নির্মূল করতে হবে

কাবুলের শাসক রব্বানী তালাবাহদের সাথে আলোচনা করার জন্য দূত পাঠাতে বললেন, তাই তারা আলেমদের দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন, কিন্তু তারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফোর্সদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হলেন, এমনকি তারা তাদের অস্ত্র সোপর্দ করবেন, মারামারি বন্ধ করবেন আর আলোচনা শুরু করবেন এই প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরেও তারা প্রেরিত দূতদের একটি অংশকে হত্যা করে আর বাকীদের ফেরত পাঠায়। যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াইশ জন। এরপর, এ ধরণের বিশ্বাসঘাতকতার পরে তালাবাহদের পক্ষ হতে কাবুল আক্রমণ করা ছাড়া আর কোন পথই খোলা রইল না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৬তম রজনীতে কাবুলের পতন হল।

তালাবাহরা ১৯৯৭ সালে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল জয় করল, আর বামিয়ান- আফগানিস্তানে রাফেদিদের কেন্দ্র-এর পতন হল ১৯৯৮সালে, আর এর পূর্বে কায়ান উপত্যকা-যার নিয়ন্ত্রণে ছিল (শিয়া) আগা খানি ইসমাইলী সৈন্যরা-এরও পতন হল। আর এখানে তালেবানেরা যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র গনীমতের মাল হিসেবে লাভ করল তা গণনা করা কোন সহজ কাজ ছিল না। আর বলা হয়ে থাকে আহল সুন্নাহ গত ৮০০ বছরে এই উপত্যকায় কখনো প্রবেশ করেনি।

আর এভাবেই, মাত্র চার বছরেরও কম সময়ে তালাবাহরা আফগানিস্তানের ৯৫ ভাগ এলাকাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারল-যার শুরু হয়েছিল সেই সেদিনের মুল্লা মুহাম্মদ ওমর-আল্লাহ তাকে হেফাযত করুন-এবং তাঁর ভাইদের একটি অন্যায়ের প্রতিবাদের থেকে, যখন তারা একতাবদ্ধ হয়েছিলেন একদল মুসলিম নারীর ইজ্জত রক্ষা করার জন্যে যাদেরকে অপহরণ করেছিল কিছু চোর আর হাইওয়ে ডাকাতদল।

হুসাইন বিন মাহমুদ
২৯ জিলকদ, ১৪২৬